ধর্মনিরপেক্ষতা
(SECULARISM)

ভারতবর্ষ বহুধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম সময়ে ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় বিভাজনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। এমন একটা দেশে স্বাধীনতার পরে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—এ বড় কম কথা নয়। (দ্রেজ ও সেন, ২০১৫)

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটি সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। ব্রিটিশ সরকারের 'বিভাজন ও শাসনের' নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অধিকাংশ নেতার লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতামুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা। সুতরাং স্বাধীনতা লাভ করার পরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের পথ থেকে সরে এলে তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদর্শ বিরোধী কাজ হতো। সেই কারণেই ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতবর্ষের সংবিধানে বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারার মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা : অর্থ এবং ধারণা (Secularism : meaning and concept)

জর্জ জেকব হলইয়ক ১৮৫১ সালে 'ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) শব্দটি ব্যবহার করেন। এই ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন 'স্যেকুলাম' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ করলে দাড়ায় 'বর্তমান যুগ'। ল্যাটিনে 'স্যেকুলাম' শব্দের আর একটি অর্থ হলো 'পৃথিবী'। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে বোঝায় ধর্মীয় অবস্থানের বিপরীতে 'পার্থিব অবস্থান' কে। ধর্মনিরপেক্ষতা-এর আভিধানিক অর্থ হলো যা অলৌকিক নয়, লৌকিক; অপার্থিব নয়, পার্থিব; অতীন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' জীবন ও জগতের অনুধাবনে এমন এক বিশ্ববীক্ষা সৃজনের চেষ্টা করে যা ধর্মীয় কল্পনা ও অনুধ্যান থেকে মুক্ত এবং যা যুক্তিগ্রাহ্য, বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ।

Scanned with CamScanner

পাশ্চাত্য সমাজে চার্চ ও তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তি গুলিই 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিতি পেল। আর যে সব প্রক্রিয়া ধর্মীয় আধিপত্যবাদের পতন এবং পাশাপাশি মানুষের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করল সে সব প্রক্রিয়াকে 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ' (Secularisation) বলা হলো। রোমিলা থাপার এর মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষ' হচ্ছে এমন একটা ভাবনা যা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়ত্তে রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে ধর্মের নামে যে নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় তার থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখে। থাপার এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মকে অস্বীকার করা বোঝায় না বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মের কর্তৃত্বমুক্ত করাকে বোঝায়।

সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র এবং শাসক শ্রেণির ধর্মের প্রতি নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতা বোঝায়। ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' অর্থ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলা নয়। কেউ যদি কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী হন সেই ধর্ম পালনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার। তবে ধর্মীয় আচার-আচরণ সীমাবদ্ধ থাকবে বাড়িতে বা ধর্ম স্থানে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা থাকবে না। রাষ্ট্রের কাজে ধর্ম হস্তক্ষেপ করবেনা আবার ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের অযথা প্রবেশ নিষেধ। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে বা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোনোরকম বৈষম্য মূলক আচরণ করতে পারবে না। (রোমিলা থাপার, ২০১৫)

পাশ্চাত্য সমাজে ধর্মনিরপেক্ষকরণ উত্তরোত্তর শক্তিশালি হচ্ছে। মানুষের ধর্মগোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আগের তুলনায় দুর্বল হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে, বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বেশিমাত্রায় যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি, পাশ্চাত্য সমাজে এটাও লক্ষনীয় সমাজের সংহতি সাধনকারী শক্তি হিসেবে ধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্য ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে সমাজের ঐক্য সঞ্চারকারী শক্তি হিসেবে জায়গা নিচ্ছে জাতীয়তাবাদ এর মত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ। ব্যক্তিজীবনেও ধর্মনিরপেক্ষতা অধিকতর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দিচ্ছে। তবে, পাশ্চাত্য সমাজেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ধর্ম একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি (Nature of secularism in India)

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি পশ্চিমী সমাজগুলি থেকে অনেকটাই আলাদা। পশ্চাত্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ যথেষ্ট মাত্রায় ক্রিয়াশীল। কিন্তু, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা মূলত রাষ্ট্রের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা শোনা যায় কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কথা খুব বেশি আলোচিত হয় না। এর অন্যতম কারণ হলো, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পশ্চিমী ধারণা থেকে ভারতবর্ষে এ সংক্রান্ত ধারণা বহুলাংশে ভিন্ন। ভারতবর্ষে প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। পশ্চিমী সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান জনিত পার্থক্যের জন্যই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি পশ্চিমের থেকে ভিন্ন।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রোমিলা থাপার-এর মতে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শগতভাবে সর্বধর্মের সহাবস্থানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই সহাবস্থানের ভিত্তির উপর নির্দিষ্ট হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নানা কারণেই অসম্পূর্ণ। কারণ ধর্মের এক্তিয়ার ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে এর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে ধর্মের সহাবস্থান আছে কিন্তু সাম্য এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথক ধর্মের কারণে অসমব্যবহারের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। আইনের চোখে সব ধর্মের মানুষের সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে সামাজিক -সাংস্কৃতিক স্তরে সব ধর্মের সম মর্যাদা।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি বুঝতে হলে মূলত তিনটি স্তরে এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন— (১) রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে, (২) সামাজিক বা আচারগত স্তরে এবং (৩) বৌদ্ধিক বা চেতনার স্তরে।

ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে প্রাচীনকালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম ছিল। পোপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে যাজকগণ তাঁদের চূড়ান্ত ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের, এমনকি রাজার উপরও নিপীড়ন চালাতেন। তাই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে চার্চের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষ এবং রাজন্যবর্গ উভয়েই সংগ্রাম চালিয়েছিল। ইউরোপে এ কারণে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চার্চের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি সক্রিয় হল সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিত হল। যে সকল প্রক্রিয়া ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের পতন এবং যুক্তিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করল, সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া' নামে পরিচিত হল।

Scanned with CamScanner

অতএব পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইউরোপের অনুরূপ কোনো সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের দৃষ্টান্ত নেই। হিন্দু বা ইসলাম কোনো ধর্মেই ব্রাহ্মণ বা উলেমারা চার্চের সংগঠিত যাজকদের মতো জনসাধারণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়নি। তাই প্রাক্-মুসলমান বা মুসলমান আমলে ভারতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সাথে রাজার বা জনসাধারণের সংঘর্ষের কোনো ইতিহাস নেই। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালের ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলি বাদ দিলে ভারতীয় সমাজে অন্তর্গোষ্ঠী স্তরেও সাধারনভাবে ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্য বজায় ছিল।

ভারতে বহুযুগব্যাপী অসংখ্য উপাসক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। অতএব ধর্মীয় সহনশীলতা এদেশের মুখ্য সামাজিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হিসেবে চিরকালই পরিগণিত হয়েছে। সম্রাট অশোক তাঁর দ্বাদশ শিলালিপিতে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি শুধু সহনশীলতা নয়, শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানান। একথা অবশ্যই বলা চলে না যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ যাবতীয় ধর্মীয় উত্তেজনা ও সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। কিন্তু তিন হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারতের যে দীর্ঘ ইতিহাস তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অতীতে এদেশে তিক্ত ধর্মীয় সংঘর্ষ বা যুদ্ধের বিশেষ কোনো উদাহরণ নেই। এমনকি এদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলেও কোনো বড়ো ধর্মীয় যুদ্ধ হয়নি। কয়েকজন অসহিষ্ণু শাসকদের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে মুসলমান শাসকগণ ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহাবস্থানের নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে ওই সময়ে ইউরোপে মারাত্মক ধর্মীয় সংঘর্ষ চলেছে। ভারতে কালক্রমে হিন্দুরা মুসলমান রাজাদের প্রশাসনিক কাঠামোতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্জন করেছে। মুসলমান আমলেও সরকারিভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

ভারতে ইংরাজদের আগমনের পর প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশীয়দের ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকত। কিন্তু উইলিয়াম বেন্টিক যখন বড়লাট হন তখন তিনি রামমোহন রায়-সহ অন্যান্য প্রগতিশীল ভারতীয়দের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এদেশীয়দের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নীতি পরিত্যাগ করেন। তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বে ১৮২৮ সালে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হয় এবং ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়। কুপ্পুস্বামীর মতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি সহনশীলতা বজায় রাখা এবং সমাজসংস্কারের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হলে ধর্মীয় বিষয়াদিতে কিছুটা পরিমাণে হস্তক্ষেপ করা— এ দুটি নীতি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Scanned with CamScanner

যে-সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গড়েছিলেন তাঁরা আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সাল নাগাদ বাল গঙ্গাধর তিলক ও অরবিন্দ ঘোষের মতো নেতারা তাঁদের আচার-আচরণে হিন্দুত্বের প্রকাশ ঘটাতে লাগলেন। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হল যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অধিকারী ছিল। এ সকলের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৯ সালে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি উদ্ভাবিত হল এবং কালক্রমে দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম হল। অবশেষে ১৯৪৭ সালে এ-দেশ বিভক্ত হল এবং পাকিস্থানের ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্ম হল।

গান্ধীজি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হলেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর প্রার্থনা সভাতে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদি থেকে পাঠ করা হত এবং সেই সভাতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা জড়ো হতেন। তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্মাবলীর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিভিন্ন জাতের মধ্যকার ব্যবধানের অবসান ঘটানো, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন আটকানো যায়নি।

উনবিংশ শতকে ভারতে যে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মননশীলতা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যে ধারা আরও বলবান হয়ে ওঠে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বরণ করে নেওয়া হয়। ভারতের মোটামুটি ৮৫ শতাংশ অধিবাসী হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এদেশে কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, যদিও পার্শ্ববর্তী পাকিস্থানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বরণ নেওয়া হয়। ভরতীয় সংবিধানের ২৫,২৬ এবং ৩০ নম্বর ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির ধর্মীয় আনুগত্য নির্বিশেষে তার সাথে নাগরিক হিসেবে বৈষম্যহীন আচরণ করতে বাধ্য। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের উন্নতি বিধান করবে না অথবা কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।

তবে লুথেরা এবং স্মিথের মতে ভারতীয় রাষ্ট্র কিন্তু কোনো কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারা অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং হরিজনদের জন্য হিন্দু মন্দিরসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া, ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপের নিদর্শন। তেমনি আইনে মন্দিরসমূহের প্রশাসনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ধর্মীয় দান সংক্রান্ত বিভাগ স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক যে

Scanned with CamScanner

সকল আইন এদেশে রচিত হয়েছে সেগুলি ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নিদর্শন মাত্র। কুপ্পুস্বামীর মতে খ্রিস্টানদের চার্চের অনুরূপে হিন্দুদের কোনো সংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং তারই সাথে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সংস্কারসাধনের ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। কিন্তু স্মিথের মতে হরিজনদের জন্য হিন্দু মন্দির সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করার মতো সমাজ সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়াদিতে অসম্পৃক্ত থাকার যে অঙ্গীকার করেছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। আবার একদিকে যেখানে রাষ্ট্র মূলত হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির সংস্কারসাধন করে চলেছে, অন্যদিকে সেই রাষ্ট্র এখনও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে পারেনি।

শ্রীনিবাস হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক বা আচরণগত স্তরে যে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের ফলেই এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতি, শহরাঞ্চলের উদ্ভব, স্থানিক সচলতার বৃদ্ধি এবং শিক্ষাবিস্তারের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশের ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে। শ্রীনিবাসের মতে, ভারতে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির তুলনায় হিন্দুরাই এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত, হিন্দুধর্মের মৌলিক ও সর্বব্যাপ্ত শুদ্ধি-অশুদ্ধির ধারণা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন কারণে হীনবল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় এই ধর্মের অস্তিত্ব জাতব্যবস্থা, যৌথ পরিবারব্যবস্থা এবং গ্রামসম্প্রদায়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে হিন্দুধর্মের উপর ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার অভিঘাত অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে।

শুদ্ধি-অশুদ্ধির ধারণা ব্যবহারিক হিন্দুধর্মের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। 'শুদ্ধি' বলতে শুধু পরিচ্ছন্নতা বোঝায় না, তা এক ধরনের পবিত্রতারও দ্যোতক। আবার 'অশুদ্ধি' বলতে শুধু অপরিচ্ছন্নতা বোঝায় না, তা কিছুটা পরিমাণে অপবিত্রতাকেও নির্দেশ করে। হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতের মধ্যে কাঠামোগত ব্যবধান শুদ্ধি-অশুদ্ধি দ্বারা নির্দেশিত হয়। একটি উচ্চতর জাত একটি নিম্নতর জাত অপেক্ষা শুদ্ধ এবং এই শুদ্ধি বজায় রাখার জন্য উচ্চতর জাতের লোকেরা নিম্নতর জাতের লোকেদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে। তাদের উচ্চাবচ বিন্যাসের সাথে সাথে খাদ্য, পেশা ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর উচ্চাবচ বিন্যাসও সম্পৃক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৃহদংশের উচ্চ জাতের লোকেরা নিরামিষাশী এবং নিম্ন জাতির লোকেরা আমিষাশী।

বস্তুত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ মৎস্যভোজী বলে অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ তাদের কিছুটা

Scanned with CamScanner

চোখে দেখে। তেমনি শারীরিক আয়াসসাধ্য কর্মগুলি শারীরিক আয়াসহীন কর্মগুলির তুলনায় নিম্নস্তরে বিবেচিত হয়। আবার শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলির মধ্যে মনুষ্যবর্জ্য ও অন্যান্য অশুচি পদার্থ নাড়াচাড়া করা বা চামারের কাজের মতো কাজগুলি হীনতম ও অশুদ্ধিকারক হিসেবে বিবেচিত হয়। নিম্নতর জাতের লোকেরাই এ সকল পেশায় নিয়োজিত হয়।

শুধু জাতব্যবস্থা নয়, জ্ঞাতিসম্পর্কও অশুদ্ধির সাথে জড়িত। জ্ঞাতিদের মধ্যে নবজন্ম ও মৃত্যুর কারণে কয়েক দিনের অশৌচ ঘটে। রজস্বলা নারীকেও সাময়িকভাবে অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। পূর্বে নারীরা ওই তিনদিন পরিবারের দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করত না এবং তাদের সাথে সংশ্রব এড়িয়ে চলত। এছাড়াও পূর্বে পূজার্চনা ও অন্নগ্রহণের সময়ে সবাইকে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্বক শুদ্ধতা অর্জন করতে হত। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে কোনো ধরণের স্থান, বিশেষত গঙ্গা-যমুনার মতো কোনো পবিত্র নদীতে স্নান প্রত্যেককে শুদ্ধতা অর্জনে সাহায্য করে। নারীরা বিশেষত বিধবা মহিলারা এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণ শুদ্ধি-অশুদ্ধি সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটির উপর বেশি জোর দেয়। নিম্নতর জাতগুলির তুলনায় উচ্চতর জাতগুলি, বিশেষত ব্রাহ্মণরা এ বিষয়গুলি নিষ্ঠাভরে পালন করে। আবার সাধারণ ব্রাহ্মণদের তুলনায় পুরোহিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ ব্যাপারে কঠোরতা বেশি।

গত কয়েক দশক ধরে শুদ্ধি-অশুদ্ধির ধারণা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। শ্রীনিবাস মন্তব্য করেছেন, "নাগরিক জীবন তার নিজস্ব চাপগুলি দিতে থাকে এবং একজন ব্যক্তির প্রাত্যহিক দিনপঞ্জী, তার বাসস্থান, তার খাদ্যগ্রহণের সময় তার জাত ও ধর্মের তুলনায় তার কাজের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। সে যে শহরে বাস করে সেটি যদি একটি উচ্চমানের শিল্পায়িত শহর হয় তাহলে এ বিষয়টি আরও সত্য হয়ে ওঠে।" যে-সব ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে তারাও জাতব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন রীতিনীতির চাপ থেকে অনেকটা মুক্ত হয় এবং তাদের সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথাপদ্ধতিগুলি বেশি করে মেনে চলে।

বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ার ফলে শুদ্ধির ধারণার তুলনায় স্বাস্থ্যসচেতনতা অধিক গুরুত্ব লাভ করছে। প্রাচীন ধরনের শুদ্ধতার সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অনেক ক্ষেত্রেই সুতীব্র বিরোধ বর্তমান। পূর্বে ব্রাহ্মণ পাচকগণ প্রায়ই নোংরা বস্ত্র পরিধান করত যা কাচা হলেও সাবান দিয়ে উপযুক্ত ভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়নি। তীর্থস্থানগুলির অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটি বহু আলোচিত বিষয়। আধুনিককালে অনেক শিক্ষিত হিন্দু মনে করেন যে শুদ্ধতা হল মূলত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়সমূহ এবং সাধারণের মধ্যে এগুলি সম্বন্ধে মান্যতা আনার জন্য এগুলিতে ধর্মের মোড়ক দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

আগেকার দিনে বৃদ্ধারা, বিশেষত বিধবারা, শুদ্ধি-অশুদ্ধি ব্যাপারগুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন এবং রান্নাঘর ছিল সেসময়ে শুদ্ধি-অশুদ্ধি ঘটিত বিষয়গুলির কেন্দ্রবিন্দু। আধুনিক কালে শিক্ষিত গৃহবধূগণ শুদ্ধি-অশুদ্ধি অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে অধিক সচেতন। অনেক আধুনিক গৃহবধূ যতক্ষণ তাদের শাশুড়ী বা শ্বশুরালয়ের অন্যান্য বয়োবৃদ্ধা আত্মীয়াদের সান্নিধ্যে বসবাস করে ততক্ষণই শুদ্ধি-অশুদ্ধির খুঁটিনাটি নিয়মগুলি মেনে চলে। স্বামীর সাথে অণু পরিবার গঠন করে যৌথ পরিবার থেকে সরে গেলেই এ সকল নিয়মনীতির বন্ধনগুলি তাদের ক্ষেত্রে আলগা হয়ে যায়।

শুদ্ধি-অশুদ্ধি ঘটিত নিয়মগুলির আধুনিক কালে দুর্বলতার মূল উৎস হল উনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহ্যানুসারী হিন্দুধর্মের পুনর্বিশ্লেষণ করার প্রয়াস। এ সময়ে হিন্দুধর্মের সারাংশকে তার বাহ্যিক আচারগুলি থেকে স্বতন্ত্র করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মের বহু অবক্ষয় ও কুসংস্কারের মূল উৎস এই বাহ্যিক আচারগুলির কঠোর সমালোচনা স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ধর্মসংস্কারকের মুখে শোনা গেছে।

আধুনিক কালে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে জীবনচক্র-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলি (life-cycle rites) সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং এই অনুষ্ঠানগুলির সামাজিক দিকটি ধর্মীয় বা আচরণগত দিকের তুলনায় অধিক প্রাধান্য অর্জন করেছে। শিশুর নাম করণ, প্রথম মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি বেশ কিছু অনুষ্ঠান বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। আগে মেয়েরা প্রথম রজস্বলা হলে যেসব আচার অনুষ্ঠিত হত তা এখন আর হয় না। স্বামীর অন্তিম সংস্কারের সময়ে ব্রাহ্মণ বিধবার মস্তকমুণ্ডনও এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। বিবাহের সময়ে কন্যাদান ও সপ্তপদীর মতো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সময়ে শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বন্ধুরাই উপস্থিত থাকে; সাধারণ অতিথি-অভ্যাগতগণ শুধুমাত্র বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত ধর্মনিরপেক্ষ অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান (Reception) -এ অংশগ্রহণ করে। শুধু অন্তিমসংস্কার ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ এখনও মোটামুটি গুরুত্বসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্য উচ্চজাতিভুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহের বয়সবৃদ্ধির ফলে তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারছে। এর ফলে গৃহস্থালিকর্ম ও রন্ধনশালা — যা বিভিন্ন শুদ্ধি-অশুদ্ধিঘটিত আচার-বিচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল — তাদের জীবনে অনেকটাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও যৌথ পরিবারের ভাঙন নারীদের মধ্যে শুদ্ধি-অশুদ্ধিঘটিত আচার-বিচারের প্রতি অবজ্ঞার জন্য অনেকাংশে ভূমিকা পালন করেছে।

হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া অংশ হল ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়। হিন্দু জীবনযাত্রা প্রণালীর ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে এবং পাশ্চাত্যায়নের বিস্তৃতির ফলে তারা তাদের সম্মান অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক কালে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন হওয়ার ফলে পূর্বে সংস্কৃত ভাষা তথা হিন্দু শাস্ত্রাদির উপর তাদের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল এখন

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন আর নেই। অধুনা অনেক পুরোহিতের জীবনযাত্রাপ্রণালীও কিছুটা পাশ্চাত্যায়িত হয়ে গেছে। পূর্বে পুরোহিতগণ সাধারণভাবে সমাজসংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলির প্রতি বিরূপ বা উদাসীন ছিল। এখনও সম্মান ও কর্তৃত্বের হানির ফলে ধর্মীয় অথবা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা কোনো উদ্যোগ নিতে পারে না। হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী পুনর্বিশ্লেষণ করার মতো বৌদ্ধিক সামর্থ্য বা সামাজিক অবস্থানও তাদের নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে পাশ্চাত্যায়িত হিন্দু উচ্চবর্গীয়রা এই পুনর্বিশ্লেষণ করেছে। এই উচ্চবর্গীয়গণ সনাতন আচার-বিচারের বিরুদ্ধতা করায় ঐতিহ্যগত প্রথাপদ্ধতিসমূহ অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে। 7667

জাতব্যবস্থা, পরিবারপ্রথা ও গ্রামসম্প্রদায়—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও কার্যগত গুরুত্বপূর্ণ নানা পরিবর্তনের ফলে হিন্দুধর্ম অনেকটা উন্মুক্ত ও তরলীকৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্যদিকে নতুন নতুন সংস্থার বিকাশের ফলে পুনর্বিশ্লেষিত হিন্দুধর্ম একটি কাঠামোগত অবয়ব লাভ করেছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন রামকৃষ্ণ মিশন ও আর্য সমাজের মতো অপেক্ষাকৃত নতুন ধর্মসংগঠনগুলি আছে, অন্যদিকে তেমনি স্মার্ত, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্ব ও লিঙ্গায়েতের মতো পুরাতন ধর্মসংগঠনগুলিও আছে যারা নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায় আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

হিন্দুসমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রণালীর সাথে সাথেই আধুনিকীকৃত ধর্মভিত্তিক সংস্থা, ব্যবস্থা ও বিষয়াদির উদ্ভব ঘটছে। সম্প্রতি বিভিন্ন খ্যাতনামা সাধুসন্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মসংগঠনের উদ্ভব ঘটছে। এরকম একজন সাধু হলেন মহারাষ্ট্রের সিরদির সাঁইবাবা। ভারতের বিভিন্ন শহরে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে সাঁইবাবার ভজন গাওয়া ও আরাধনার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। অন্যান্য বিখ্যাত সাধুর আরাধনা এবং ভজন ও কীর্তন গাওয়ার জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছে।

বর্তমানে গণমাধ্যমসমূহের প্রভাবে ঐতিহ্যগত হিন্দুসংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু পুরাণ ও মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী, সাধুসন্তদের জীবনী ও ধর্ম বা নীতিভিত্তিক নানা কবিতা সংকলিত থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকপত্র এবং শিশু পাঠ্য পুস্তিকাতেও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণসমূহ থেকে নানা কাহিনী চয়ন করা হয়। বেতার ও দূরদর্শনে প্রত্যহ সকালে এবং অন্যান্য সময়েও ভক্তিগীতি প্রচারিত হয়। রথযাত্রা বা দশেরার মতো বিখ্যাত ধর্মোৎসবগুলি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়। হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে নানান চলচ্চিত্র ও নির্মিত হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিতও হয়। এই গণতন্ত্রীকরণের ফলে অবশ্য ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অনেকটা পরিবর্তনও ঘটেছে। অধুনা শহরাঞ্চলে অনেক শিশু রামায়ণ-মহাভারত না পড়ে দূরদর্শন মারফত রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি হয়েছে যে বিভিন্ন সন্ন্যাসী সংগঠন ও মন্দিরগুলির অর্থসম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ফলত হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি সামাজিক দায়িত্বশীলতার বোধ গড়ে উঠেছে। যেমন বিশেষ আইনবলে তিরুপতি মন্দিরের সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণেও ব্যয়িত হচ্ছে। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী-সংগঠনগুলিও তাদের নিজেদের হোস্টেল, স্কুল ও কলেজ চালাচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাও এ ব্যাপারে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার ভূমিসংস্কারমূলক আইন বলবৎকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র অনেক মন্দিরের ভূ-সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে।

বর্তমানে রাজনীতিবিদরা সংকটের সময়ে বা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিখ্যাত সাধু সন্ন্যাসীদের দর্শনপূর্বক তাদের কৃপাভিক্ষা করেন। আবার বিভিন্ন সন্ন্যাসী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও রাজনীতিবিদদের সাথে সংশ্রব রেখে চলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। আধুনিককালে জাতীয়তাবাদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়টি হিন্দুধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ভারতে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির বহুল প্রচারের দ্বারা ধর্মের সাথে রাজনীতির সংশ্রবের ব্যাপ্তির বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। এক কথায় বলা যায় যে বর্তমানে হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিন্তভাবে জাতব্যবস্থা, পরিবারপ্রথা ও আত্মীয়তাসম্পর্ক এবং গ্রামসম্প্রদায়ের মতো ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামোগুলির উপর নির্ভরতা হারিয়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

চেতনাগত বা বৌদ্ধিক স্তরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ধর্মহীনতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা বা সর্বধর্মসহিষ্ণুতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে পৃথিবীর দৈবী চরিত্রের ধারণা বর্জিত হয় এবং মানুষ সমাজকে আর প্রাথমিক ভাবে ধর্মীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুধাবন করে না। ভারতবর্ষে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে মূলত অসাম্প্রদায়িকতাকে বোঝায়। এখানে এটাই ভাবা হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় স্তরের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে সহায়তা করবে, যে চেতনা ধর্মকে অস্বীকার না করেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বোধের উর্ধ্বে বিরাজ করে।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে চেতনাগত স্তরে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। তাদের মতে ভারতের সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত। যে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা আছে সে তার স্বাধীন বিবেকের প্রণোদনায় নিজের পছন্দসই ধর্মপ্রচার ও ধর্মপ্রবর্তন— এগুলি মধ্যে একটি, দুটি বা সবকটি করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। সে আবার বিবেকের নির্দেশানুযায়ী নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক হতে পারে, ধর্মীয় মনোভাবের বিরুদ্ধাচারীও হতে পারে। বিবেকের স্বাধীনতার অঙ্গন সদর্থক ও নঙর্থক উভয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই প্রসারিত। বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী বলে এর আওতায়

Scanned with CamScanner

এর অনেক ধরণের স্বাধীনতা এসে পড়ে। কিন্তু সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে অবাধে ধর্মবিশ্বাস জানানো, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করার অধিকার। ফলে বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারের ব্যাপ্তি পরবর্তী বাক্যবন্ধের অব্যাপ্তির অন্তর্ঘাতে খন্ডিত হয়েছে। বিবেকের মৌল আধার হল স্বানুভব। যে পথেই এই অনুভবে পৌঁছান যাক না কেন, তাতে অন্যের সাথে সংঘাতের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ধর্মাচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক নির্ভর।

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যে-কোনো সময়ে অন্যের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে, তাতে সংঘাত ও সংঘর্ষের উদ্রেক ঘটে। আবার স্বক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে সংযত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং অবিরোধী ধর্মাচরণ করা যদিও বা সম্ভব, ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তা কখনোই সম্ভব নয়। গুরুশিষ্য পরম্পরায় অনুগামী এক সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য প্রচারককে আপন ধর্মমতের পক্ষে নিরন্তর প্রচার চালাতে হয়। অনেক মানুষকে দলে টেনে এনে অনুগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়োজন হয়। অপরের ধর্মমতকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের ধর্মমত জহির করতে গেলে অনিবার্যভাবে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিরোধের বীজ বপন করা হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধর্মকলহের রক্তাক্ত কাহিনিগুলি একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের বিপরীত ও বৈরী এবং যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার জন্য ধর্মকে অগ্রাহ্য করা প্রয়োজন —এটি অবশ্যই একটি চরমপন্থী অবস্থান। অধিকাংশ চিন্তাবিদ এই ধারণাকে সত্য বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন যে বৈরীভাবমূলক হওয়ার বদলে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পারস্পরিক অনন্যতার সম্পর্কবিদ্যমান। ধর্মের প্রধান কথা হল ঐশ্বরিক সত্তায় এবং পরলোক জগতে বিশ্বাস। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় নয়; ধর্মনিরপেক্ষতা আনন্দ সহকারে এগুলিকে ধর্মের হাতে ছেড়ে দেয়। লাউয়েরের মতে ধর্মনিরপেক্ষকরণের পাশাপাশি ধর্মও বিকশিত হতে পারে মানুষের নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মকে পরস্পরবিরোধী বলে বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না। লাউয়েরের মতে, "ধর্মনিরপেক্ষকরণ বড়ো জোর ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, ধর্মের বিলুপ্তি সাধন করে না।"

তবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সর্বধর্মসহিষ্ণুতার অর্থে গ্রহণ করলে সেই আদর্শটিও ভারতে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। অমর্ত্য সেনের মতে যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে প্রচলিত আছে তা কেবল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর অসহিষ্ণুতার প্রবণতাকে সন্তুষ্ট রেখেছে। ধর্মসম্প্রদায়গুলির পরস্পরকে সহ্য করার যে ক্ষমতা রয়েছে তার সমন্বয়ের সমর্থনে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি এখনও দৃঢ় হয়নি। কোনো বক্তব্য বা কর্মসূচি যদি

Scanned with CamScanner

বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়গুলির একটিকেও রুষ্ট করে তাহলে তাকে সত্বর নিষিদ্ধ করার জন্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের যে প্রশংসনীয় অবস্থান, তার সঙ্গে এ বিষয়টি ঠিক খাপ খায় না।

উপসংহার (Conclusion)

অনেকেই একথা মনে করেন যে ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি সত্য হিসেবে তেমন ভাবে বিদ্যমান নয়। কেউ কেউ আরও স্পষ্ট ভাবে বলেন, ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবত অস্তিত্বহীন। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল ও শাসক গোষ্ঠী গুলি অনেক সময়ই তাদের সমভাবনার ধর্মীয় সংগঠনগুলির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন এবং ধর্মীয় সংগঠন গুলির মধ্যে দুরত্ব বজায় রেখে চলার ধারনা কষ্টকল্পিত।

ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতায় কেউ কেউ একথা বলেন যে এটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধারণা। সেই কারনে প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ভারতের সমাজের সাথে মেলানো যায় না। এই ধরণের ভাবনায় বিশ্বাসী মানুষদের কাছে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রোমিলা থাপার এর প্রশ্ন-ভারতবর্ষে জাতি-রাষ্ট্রের (Nation) ভাবনা বা গণতন্ত্রের ভাবনার ক্ষেত্রেও কী একই কথা বলা হবে? কারণ এসবও তো স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নতুন চিন্তা। তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন করার অর্থ পাশ্চাত্য চিন্তার পদানত হওয়া নয়, বরং ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। এটা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের নতুন অভিজ্ঞতা যা সারা বিশ্বের আধুনিক ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রকে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে মান্যতা দিয়েছে, যা ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতায় নতুন। রোমিলা থাপার -এর যুক্তিমত, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গতিশীল রাখার জন্য অপরিহার্য্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে প্রায় সর্বদাই দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত করেছে কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নিছক রাজনীতির উর্দ্ধে একটি ধারণা।

Scanned with CamScanner